ইসলামের অপর পৃষ্ঠা ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ

আকাশ মালিক

(৫)

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

কয়েক মাস পর আজ তত্ত্বাবধায়ক কমিটি কোরআন নিয়ে বসেছেন কোরানিক ফয়সালা দিতে। হায়রে জগতের অভাগা মুসলমান ! আজ অবধি তারা বুঝতে সক্ষম হলোনা, রমজান মাসের যে দিন থেকে কোরআন নামক বইখানি আরবের বুকে নেমে আসলো, সেদিন থেকে শান্তি নামের সুখ-পাখিটি ঐ বই এর নাম শুনলে লক্ষ-যোজন দূরে পালিয়ে যায়। মুয়াবিয়ার প্রতিনিধি-প্রধান সিংহ-রূপী আমর ইবনে আ'স এর সামনে, আলীর প্রতিনিধি-প্রধান আবু মুসা মুসিক-ছানার সমান। প্রবীন নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস (রাঃ) আবু মুসাকে ধূর্ত আমর সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন। তিনি বল্লেন- 'সাবধান আবু মুসা, এই ধূর্ত মানুষটা মিশরের গভর্ণর থাকাকালিন সময়ে খলিফা উসমানও তাঁকে ভয় পেতেন। খলিফার নিযুক্ত মিশরের গভর্ণর ইবনে-সা'দকে বাধ্য করেছিল তার সাথে ক্ষমতা ভাগা-ভাগি করতে'।

আমর ইবনে আ'স হজরত আবু-মুসাকে এক গোপন বৈঠকে আহ্বান করলেন। মুয়াবিয়ার ট্রেইনিং প্রাপ্ত আমর, আবু-মুসাকে মাত্রাতিরিক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখালেন। শাহী ভোজন ও আপ্যায়ন-পর্ব সমাপন করে আমর ইবনে আ'স আবু-মুসাকে জিজ্ঞেস করেণ- 'আপনার কি মনে হয় আলী কোনদিন উসমান হত্যার বিচার করবেন'? আবু-মুসা উত্তর দেন- 'উসমান হত্যা-পূর্ব সময় থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে, আমি মনে করি এ সব কিছুর জন্যে হজরত আলী ও মুয়াবিয়া সমভাবে দায়ী'। এ উত্তরটাই হজরত আমর ইবনে আ'স কামনা করেছিলেন। তারিখ ঘোষনা করে সমাবেশ ডাকা হলো বিচারকদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হবে। সমাবেশে আমর ইবনে আ'স খুব নম্র ভাষায় বিনয় সহকারে অনুরুধ করলেন, আবু-মুসা যেন প্রথম বক্তব্য প্রদান করেন। আবু-মুসা ঘেষনা দেন- 'আমরা তত্ত্বাবধায়ক কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপণীত হয়েছি যে, আজ থেকে আলী ও মুয়াবিয়া উভয়ের খেলাফত অবৈধ ঘোষনা করা হলো। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ নতুন খলিফা নির্বাচিত করবেন'। তারপরই আমর ইবনে আ'স তার বক্তব্যে ঘোষনা দেন- 'আবু-মুসার সাথে আমিও একমত। রাজনীতিতে আলী সম্পূর্ণই নতুন। খলিফা হওয়ার যোগ্যতা তাঁর এখনও হয়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্যের আইন প্রশাসন বলতে কিছুই নেই। জাতি আজ এক অশুভ রাহুগ্রস্থ। এই সঙ্কটময় দিনে আমীরুল মোমেনীন হজরত মুয়াবিয়ার মত একজন বিচক্ষন, দক্ষ রাজনীতিবিদ আমাদের প্রয়োজন'।

বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো আবু-মুসার মাথায়। গালি দিয়ে উঠলেন অশ্লীল ভাষায়। শুরু হলো কোরআনের 'কালাম-যুদ্ধ'। দুনিয়ার যত অশ্লীল গালি আছে তারা ছুঁড়তে থাকলেন একে অপরের প্রতি। আলীর প্রতিনিধি-দল চিৎকার করে তেলাওত করলেন কোরআনের ৭ নং সুরা আল্-আরাফের ১৭৫নং আয়াতটি-

'আর তাদেরকে পাঠ করে শুনাও ওর বৃত্তান্ত, যাকে আমি আমার নির্দেশাবলী পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সে ওসব থেকে দূরে সরে যায়, আর শয়তান তার পিছু নিল, কাজেই সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়'।
আলীর সমর্থকগণ মিছিল বের করে শ্লোগান দিতে থাকে *'মুয়াবিয়া শয়তান-মুয়াবিয়া শয়তান* '। অপর পক্ষে মুয়াবিয়ার লোকগণ নিয়ে এলো ৬২ নং আল্ জুমু-আহ্ সুরার ৫ ও ৬নং আয়াত দুটো-

'যাদের তাওরাতের ভার দেয়া হয়েছিল তারপর তারা তা অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গাধার মত, যে শুধু গ্রন্থরাজীর বোঝাই বইছে। কতো নিকৃষ্ট সে জাতীর দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী প্রত্যাখান করে। আর আল্লাহ অন্যায়কারীকে সৎপথে চালান না'।

'বলো, ওহে, যারা ইহুদী-মত পোষন করো, যদি তোমরা মনে করো যে, লোকজনকে বাদ দিয়ে তোমরাই আল্লাহর বন্ধু-বান্ধব, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

কোরআন থেকে 'কালাম-যুদ্ধ' করতে করতে তারা কোন সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারলেন না। সম্মেলন ভঙ্গ হয়ে যায়। শান্তি প্রদানে ব্যর্থ কোরআন বুকে নিয়ে তারা বাড়ি ফিরলেন। হজরত আলী কুফায় বসে সম্মেলনের এ সংবাদ শুনে খুবই আহত হলেন। আকাশ পানে দু'হাত তুলে লম্বা একটি দোয়া করলেন- *'হে দয়াময়, মহা-শক্তিমান প্রভু, তোমার সর্ব নিকৃষ্ট গজব অর্পিত করো তাদের ওপর, বিশেষ করে মুয়াবিয়া, আমর ইবনে আ'স, আবুল-আওয়ার আল্ সুলাইমি, আবি সারাহ্, হাবিব ইবনে মাসলামাহ্, আব্দুর রহমান বিন্ খালিদ, জাহাক বিন্ কায়েস, আর অলিদ বিন্ উকবার ওপর'।*

আলীর এই দোয়া আল্লাহ্‌র কাছে পৌছিল কি না জানা যায়নি, তবে মুয়াবিয়ার কানে যথা-সময়েই পৌছিল। মুয়াবিয়া জুম্‌আর নামাজের জন্যে খুৎবায় নতুন কিছু আয়াত সংযোজন করতে তার সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিলেন। মুয়াবিয়া সেদিন থেকে আইন করে, প্রতি শুক্রবার খুৎবায়, নবী পরিবার অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, হজরত হামজাহ্, হজরত আলী, হজরত ফাতেমা, হজরত হাসান ও হোসেনকে অভিশাপ দেয়া বাধ্যতামুলক করে দেন। হুজর ইবনে আ'দি নামে একজন মুসলমান মুয়াবিয়ার এ আদেশ অমান্য করায় মুয়াবিয়া তাঁকে মৃত্যু-দন্ড দেন। ঘঠনাটা হজরত মৌলানা আবুল আ'লা মওদুদী (রঃ) তাঁর 'খেলাফত ও মুলকিয়াত' কিতাবের ৪র্থ অধ্যায়ে এভাবে বর্ণনা করেণ-

'হুজর ইবনে আ'দি নবীজীর প্রীয়ভাজন একজন ধর্ম-ভীরু মুসলমান ছিলেন। হজরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) শাসনামলে যখন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে হজরত আলীকে ভর্ৎসনা ও অভিশাপ দেয়ার প্রচলন শুরু হয়, মৃত্যু-ভয়ে অনেকেই প্রতিবাদ করার সাহস পেলো না। কুফা নগরীতে হজরত হুজর ইবনে আ'দি (রাঃ) মুয়াবিয়াকে প্রত্যাখান করতঃ আলীর (রাঃ) প্রশংসা করতে লাগলেন। হজরত মুগীরা (রাঃ) কুফার গভর্ণর থাকালীন সময়ে ইবনে আ'দির কোন অসুবিধা হয়নি কারণ তখনও কুফায় খুৎবায় অভিশাপ দেয়ার প্রচলন শুরু হয়নি। কিন্তু বাসারার গভর্ণর হজরত যিয়াদের (রাঃ) আমলে কুফাকে যখন বাসারার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যিয়াদ (রাঃ) জুমআর খুৎবায় হজরত আলীকে অভিশাপ দেয়া শুরু করে দেন।

হুজর ইবনে আ'দি (রাঃ) এর প্রতিবাদ করলেন। একদিন ইবনে আ'দি (রাঃ) যিয়াদকে (রাঃ) জুমআর নামাজে দেরী করে না আসার জন্য সতর্ক করেন। যিয়াদ (রাঃ) ইবনে আ'দি ও তাঁর ১২ জন সঙ্গী-সাথীর ওপর মিথ্যা দেশদ্রোহীতা ও খলিফা মুয়াবিয়াকে অভিশাপ দেয়ার অভিযোগ এনে তাদেরকে গ্রেফতার করে মুয়াবিয়ার নিকট সিরিয়া পাঠিয়ে দেন। মুয়াবিয়া অভিযুক্ত ৮ জনকে মৃত্যুদন্ড শাস্তি দেন। তাদের একজন সাথী, হজরত আব্দুর রহমান ইবনে হাসানকে জীবিত মাটিতে পুঁতে হত্যা করা হয়। (সংক্ষেপিত)

সম্মেলনের সংবাদ শুনে কুফার জনগণ কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে যায়। হজরত আলী চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি-স্থাপনের অজুহাতে 'খোরাইজ' গোত্র সরাসরি আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করে দিল। মধ্য-পথে বিজয়-ক্ষণে যুদ্ধ থামিয়ে দেয়ায় আরেক দল অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলো। অনেকে প্রকাশ্যে বলাবলি করতে লাগলো- মুয়াবিয়া একজন সু-দক্ষ, শক্তিশালী শাসক। দিন যত যায়, মুয়াবিয়ার দল বড় ও শক্তিশালী হতে থাকলো আর আলীর খেলাফতের প্রাচীর ভেঙ্গে একটি একটি করে ইট খসে পড়তে থাকলো। কিন্তু আলী থেমে যাওয়ার পাত্র নন। মুহাম্মদের (দঃ) রক্ত তাঁর শিরা-উপশিরায়। হজরত আলী মরণ-পণ প্রতিজ্ঞা করলেন, এ অপমানের প্রতিশোধ নেবেন।

বিদ্রোহী চরমপন্থী, মৌলবাদী (Extremist, Fundamentalist) 'খোরাইজ' বা খারিজী দল আলী ও মুয়াবিয়া উভয়কে প্রত্যাখান করতঃ নিজস্ব একটি দল ঘঠন করলো। তারা আল্লাহ্‌র হুকুমত, কোরআনের শাসন কায়েম করতে চায়। তাদের মতে আলী ও মুয়াবিয়া দু'জনই কোরআন বিরোধী শাসক। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ পর্যন্ত এরা আলীর পক্ষেই ছিল। যেহেতু আলী, মুয়াবিয়ার মতো একজন বিধর্মীর সাথে শান্তি-চুক্তিতে দস্তখত করেছেন এবং রাজ্যে শারিয়ার আইন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে হজরত আলীও একজন বিধর্মী। খারিজী দল, 'হারোরা' নামক একটি গ্রামে সমেবেত হয়ে তাদের মতাদর্শ প্রচার করতে লাগলো। কিছুদিনের মধ্যেই তারা এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী জঙ্গীবাদী দলে পরিণত হলো। তাদের সাথে ভিন্নমত পোষনকারীদের বাড়ি ঘর আগুনে পুড়িয়ে, মানুষের গলা কেটে, জীবন্ত মাটিতে পুঁতে, নির্বিচারে হত্যা করে সারা এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করে দেয়। হজরত আলী দিন-রজনী কষ্ট করে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে, তাবলিগ করে কিছু লোককে পুনরায় সিরিয়া আক্রমনের জন্যে রাজী করিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, এখন তাঁর সামনে সিরিয়া আক্রমনের চেয়ে বিদ্রোহী খারিজী দলকে দমন করা আবশ্যক হয়ে গেছে। এদিকে খারিজীরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, মুয়াবিয়া, আলী ও আমর ইবনে আ'স, এই তিনজনকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরবে না। তাদের শ্লোগান হলো *'লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ্‌'* আল্লাহ্‌র শাসন ছাড়া কোন শাসন নাই। হজরত আলী তাদের কাছে লোক পাঠালেন, বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তিনি কোরআনের খেলাফ কোন কাজ করেন নাই। ব্যক্তিগত পত্র লিখলেন- 'রাজ্যে আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠা করতে সকল আগে মুয়াবিয়াকে ধ্বংস করতে হবে। আর এ জন্যে তোমাদেরকে আমার সাথে যোগদান করে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যেহাদে অংশ গ্রহন করার আহ্বান জানাচ্ছি'। তারা উত্তর দিল- 'আলী আপনি কোরআন অমান্যকারী, আপনি কোরআন বুঝেন না'। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের নেতৃত্বে বিদ্রোহী খারিজি দল, তাদের ঘাঁটি স্থাপন করলো বাগদাদ থেকে ১২ মাইল দূরে 'নাহ্‌রাওয়ান' নামক স্থানে। বসোরা সহ বিভিন্ন

এলাকা থেকে কিছু লোক এসে তাদের সাথে যোগদান করলো। ১২ হাজার সদস্যের খারিজি জঙ্গী দল এখান থেকেই রাষ্ট্রের সর্বত্র খাটি ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করবে। তাদের মুল মন্ত্র হলো রাজ্যের সকল সমস্যার ফয়সালা করবে একমাত্র কোরআন।

খারিজিদেরকে নিজ দলে আনতে সকল প্রকার চেষ্টা করে আলী ব্যর্থ হয়ে, ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়া আক্রমনের যাত্রা-পথে 'নোখাইলা' এর উপত্যকায় এসে তাবু ফেল্লেন। আলীর কাছে সংবাদ এলো- সন্ত্রাসী খারিজিরা 'নাহ্‌রাওয়ান' এর গভর্ণর হজরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে খাব্‌বাব (রাঃ) কে মুরগী-কাটা কেটে খুন করেছে, সাথে গভর্ণরের অন্তসত্তা ক্রীত-দাসী ও বনু-তায়ী গোত্রের তিন জন নিরপরাধ মহিলাকেও অত্যন্ত নির্মমভাবে তারা জবেহ্‌ করেছে। বিষয়টা তদন্ত করতে আলী, হজরত হারিস ইবনে মুর্‌রাহ্‌কে 'নাহ্‌রাওয়ান' প্রেরণ করলেন। খারিজিরা ইবনে মুর্‌রাহ্‌কে হত্যা করে ফেলে। আলীর সন্দেহ হলো, এই মুহুর্তে সিরিয়া আক্রমন করতে গেলে খারিজিরা কুফা দখল করে নিতে পারে। হজরত আলী খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। ৩৮ হিজরীর সফর মাসের ৯ তারিখ খারিজিদের সাথে আলীর যুদ্ধ হয়, যা ইতিহাসে 'যুদ্ধে-নাহ্‌রাওয়ান' বা 'খাল-যুদ্ধ' নামে অভিহিত। আলীর শক্তিশালী সৈন্যগণ অতি অল্পসময়ের মধ্যেই খারিজিদের ১২ হাজার সদস্যকে তাদের তলোয়ারের নীচে কতল করতে সক্ষম হলেন। মাত্র ৯ জন খারিজি পলায়ন করে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। দুই বৎসর পর ৪০ হিজরীতে এই ৯ জনের তিন জন মিলে হজরত আলীকে তাঁর মসজিদ প্রাঙ্গনে খুন করে।

খারিজিদেরকে হত্যা করে আলী ভেবেছিলেন একটা আপদ গেলো, এবার সিরিয়া আক্রমন করতে আর কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু বিধি বাম, আলীর সৈন্যগণ আর কোনমতেই যুদ্ধ করতে রাজী হলো না। হজরত আলীর, বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। ভগ্ন হৃদয়ে কুফায় ফিরে গিয়ে আলী নিজের লোকজনকে ভীরু, কাপুরুষ বলে ধিক্‌কার দিয়ে শান্ত হয়ে যান। এদিকে আলীর এই নীরবতা হজরত মুয়াবিয়ার মোটেই ভাল লাগলো না। মুয়াবিয়ার দৃঢ় সংকল্প- 'আমি সেই দিন হবো শান্ত, যেদিন জগতের মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়ার মত, হাশেমী বংশের কেউ থাকবেনা'। মুয়াবিয়া জানেন এখন আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সিংহ ও ছাগলের ব্যবধান।

মুয়াবিয়ার বাবা আবু-সুফিয়ান বলেছিলেন- 'শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ একদিন আসতেও পারে'। পুর্ণ প্রতিশোধ নেয়ার এখনো কিছুটা বাকি। সুতরাং দূর্বল ছাগলের শক্তিও আলীর আছে কি না পরীক্ষা করতে মুয়াবিয়া দিকে-দিকে ছোট্ট ছোট্ট সেনা-দল পাঠালেন। আজ থেকে কয়েক যুগ পুর্বে ঠিক যেভাবে নবী মোহাম্মদ রাতের অন্ধকারে একটি একটি করে আরব অমুসলিম গোত্রের ওপর অতর্কিতভাবে হামলা করে তাদের সহায় সম্পত্তি দখল করেছিলেন, মুয়াবিয়ার সৈনগণ সেভাবেই একের পর এক আলীর প্রদেশ সমুহ দখল করতে লাগলো। ইসলামের জন্মভূমি ও নবী মুহাম্মদের রাজধানী মদীনা আক্রমন করার জন্যে সাহাবী হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হজরত বাশারকে সেনাপ্রধান করে একটি শক্তিশালী দল হিজাজ (মদীনা) পাঠালেন। হজরত বাশারের সৈন্যবাহিনী দানবের মত আক্রমন করে বসে মদীনার মানুষের ওপর। তারা ক্ষনিকের মধ্যেই সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়। ভীত-সন্ত্রস্ত মদীনাবাসী বিনা যুদ্ধেই মুয়াবিয়ার সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করলো। বিজয়ী বাশার মদীনাবাসীর

উদ্দেশ্যে বল্লেন- ‘মদীনার লোক, যদি আজ খলিফা মুয়াবিয়ার নির্দেশ নিয়ে না আসতাম, আল্লাহর কসম মদীনার একটা পুরুষও আমি জীবিত রাখতাম না’। সেনাপতি বাশার, নবী মুহাম্মদ কর্তৃক বনি মুত্তালিক গোত্রের ওপর আক্রমনের তুলনায় মদীনাবাসীর ওপর অশেষ করুণাই করলেন। সেদিন মুহাম্মদ বনি মুত্তালিক গোত্রের একটা পুরুষকেও জীবিত রাখেন নাই, উপরন্ত তাদের সকল নারীদেরকে বন্দী করে তাঁর সেনাবাহিনীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মদীনা জয় করে বাশার, তার দল নিয়ে ইয়েমেন দখল করতে রওয়ানা হলেন। মদীনা পতনের সংবাদ পেয়ে হজরত আলী কাগুজে বাঘের মত কিছুক্ষণ গর্জন করলেন। কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। হিজাজের মত একই পদ্ধতিতে আক্রমন করে সেনাপতি বাশার ইয়েমেন দখল করে নেন। তবে সেখানকার গভর্ণর হজরত উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বাধা প্রদান করায় তাঁকে ও তাঁর ছোট ছেলেকে বাশার হত্যা করেন।

ছোট ছোট রাজ্য গুলো দখল করে হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এবার দৃষ্টি ফেল্লেন মিশরের ওপর। সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন- ‘তোমরা মিশরের গভর্ণর আবুবকরের পুত্র মোহাম্মদকে হত্যা করতে পারবে না, তাকে বন্দী করে আমার কাছে নিয়ে আসবে, আমি নিজ হাতে তার বিচার করবো’। উল্লেখ্য, আবুবকর মদীনার খলিফা হওয়ার পর, হজরত আবু-সুফিয়ান তাঁর পুত্র মুয়াবিয়াকে বলেছিলেন- ‘এই আবুবকর তোমার দুই ভাইয়ের হত্যাকারী, আমার বিশ্বাস তুমি একদিন এর প্রতিশোধ নেবে’। মুয়াবিয়ার সন্দেহ ছিল আলী কুফা থেকে সৈন্য পাঠিয়ে মিশর রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আলীর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। সুতরাং মিশর দখল করতে মুয়াবিয়ার সেনাবাহিনীর তেমন বেগ পেতে হলো না। মোহাম্মদকে বন্দী করে মুয়াবিয়ার কাছে নিয়ে আসা হলো। মুয়াবিয়া ঠান্ডা মাথায় মোহাম্মদকে বলেন- ‘তোমাকে এমন মৃত্যু উপহার দেবো যা উসমান হত্যার চেয়ে ভয়ঙ্কর, তরবারী ও বর্শার আঘাতে মৃত্যুর চেয়েও কষ্টদায়ক। মুয়াবিয়া মোহাম্মদকে শুকনো খড়-কুটা দিয়ে মুড়িয়ে বস্তা-বন্দী করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। মুয়াবিয়ার মনে আছে, বদরের যুদ্ধে তার পিতা আবু-সুফিয়ানের বিরুদ্ধে এই আবুবকর, তার পুত্র মোহাম্মদ ও তার কন্যা আয়েশা অংশ গ্রহন করেছিলেন। এ কারণেই মুয়াবিয়া সেদিন জামাল যুদ্ধে আলীর বিরুদ্ধে আয়েশাকে সাহায্য করেন নি।

হিজরী ৪০ সনের রমজান মাস। খারিজি দলের তিনজন লোক হজরত আলীকে হত্যার উদ্দেশ্যে মসজিদের পাশে অবস্থান নেয়। আলী মসজিদ থেকে বেরিয়ে, দ্বার-প্রান্তে আসামাত্র শা’বিব ও আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম, আলীর মাথায় তলোয়ার দিয়ে সজোরে আঘাত করে। কিছুদিন পরেই ৬৬১ খৃষ্টাব্দে হজরত আলী কুফায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেণ।

পিতৃ-শোকে কাতর হজরত হাসান (রাঃ) বাবার শোক-সভায় বলেন- ‘আজ এমন একটি পবিত্র মাসে নবীজীর শ্রেষ্ট মানুষটিকে ঘাতকরা হত্যা করলো, যে মাসে কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছিল। যে মাসে হজরত ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ্ আকাশে তুলে নেন, যে মাসে হজরত মুসা (আঃ) তুর পাহাড়ে আল্লাহ্র সাথে কথা বলেন। কোরআনের শাসন প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসীরা কোরআন লেখককেই খুন করে ফেল্লো’। উল্লেখ্য হজরত আলী নবী মোহাম্মদের পাশে-পাশে থেকে কোরআনের বাণী লিখতেন। হজরত উসমান যখন কোরআন সংকলন করেন,

আলীকে সংকলন-কমিটি থেকে বাদ দেয়া হয়। ৩৩ সন্তানের জনক, হজরত আলী জীবনে তাঁর প্রথম স্ত্রী ফাতেমার মৃত্যর পর আরো ৮ জন রমনীর পাণি গ্রহন করেছিলেন।

হজরত আলী দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু মুয়াবিয়া আলী-পরিবারের পিছু ছাড়লেন না।

হজরত হাসান (রাঃ) ঘর-মুখো নিরীহ, সরল, স্বভাবের মানুষ ছিলেন। রাজনীতি বা ক্ষমতালোভী ছিলেন না, তবে নারী-লোভী ছিলেন। হজরত আলীর ভক্তগণের চাপে প্রথমে অস্বীকার করে, পরে অনিচ্ছাকৃতভাবে খেলাফত গ্রহণ করেণ। হাসানকে ক্ষমতা থেকে সরানো, এখন হজরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) জন্যে মাটির পুতুল ভাঙ্গার মতই সহজ। এক নাগাড়ে দীর্ঘ তিন যুগের শাসনকার্য পরিচালনায় দক্ষ মুয়াবিয়া সবগুলো কাজ করেণ সু-পরিকল্পিতভাবে। তিনি জানেন ধর্ম, অশিক্ষিত ও দুর্বল মানুষকে ধোঁকা দেয়ার একটি সহজ অথচ শক্তিশালী অস্ত্র, তা দিয়ে উন্নতশীল রাষ্ট্রগঠন বা গণ-কল্যানমূখী কোন কাজ সাধন হয়না। তাই মাঝে-মাঝে তিনি প্রয়োজনে খুব সতর্কতার সাথে ধর্ম ব্যবহার করতেন, কিন্তু রাষ্ট্র-পরিচালনায় ধর্মের ধারে-কাছেও যেতেন না। বরং তিনি পার্শ্ববর্তি খৃষ্টান-রাজ্য, বাইজানটাইন, আরমানিয়ার রাষ্ট্র-পরিচালনা পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। পরবর্তিতে ঐ সকল এলাকা দখল করে বহু খৃষ্টান ও ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী লোকজনকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপুর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। বহুজাতিক সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, রাজতন্ত্রের আদলে, গণতান্ত্রীক প্রক্রীয়ায় হজরত মুয়াবিয়া, ধর্মনিরপেক্ষ এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। যুদ্ধকালীন কঠিন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে সিরিয়ার জনগণ সব সময় তাদের নেতার পাশে থেকে সমর্থন দিয়েছে। পক্ষান্তরে হজরত আলীর ধর্মতান্ত্রীক ঘুনে-ধরা পঁচা সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ অনাস্থা এনে দলে দলে মুয়াবিয়ার দলে আসতে থাকে। হজরত হাসানের সময়ে এসে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। নবীর বিশ্বস্ত সাহাবীগণ, হজরত আলীর একান্ত বাধ্য সৈন্যগণ, এমনকি নবী বংশের হজরত হাসানের আপনজন চুরি, দুনীতি, মিথ্যাচারে জড়িয়ে পড়েন। হাসান একদিন দুঃখ করে বলেন- 'এই দুনিয়ায় নবীর আদর্শ, কোরআন হাদীসের অনুসারী একজন মানুষও কি বেঁচে নেই'?

হজরত মুয়াবিয়া কুফা ও বাসারার অবস্থা পরখ করার লক্ষ্যে দু'জন গুপ্তচর তথায় পাঠালেন। একই সাথে কুফার অদূরে ৬০ হাজার সৈন্য মোতায়েন করে হাসানকে, পত্র-মারফত স্পষ্ঠ জানিয়ে দিলেন- 'সেচ্ছায় আত্মসমর্পন করো, নইলে অস্ত্রের মাধ্যমে কুফা দখল করা হবে'। হাসান তাঁর পিতার রক্ষিত ৪০ হাজার সৈন্য থেকে, হজরত কায়েসকে সেনাপতি করে ১২ হাজার সৈন্য মুয়াবিয়ার মুকাবিলায় সীমান্তে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে পারস্যের প্রাচীন বিলাসবহুল কুসুম কাননে বিশ্রাম নেন। বিশ্রামরত অবস্থায় হাসানের কাছে খবর এলো- সেনাপতি হজরত কায়েস আর বেঁচে নেই, সৈন্যগণ রণভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেছে। পালিয়ে আসা হাসানের নিজের সৈন্য ও বিক্ষুব্ধ জনতা দৌড়ে এসে তাঁর রঙ্গ-মঞ্চের তাঁবু ছিড়ে-ভেঙ্গে, ছিন্ন-ভিন্ন করে তাদের মনের ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করলো। যে মখমল কার্পেটে বসে তিনি আয়েশে আরাম করছিলেন, একজন লোক হেঁচকা টানে কার্পেটখানি উঠিয়ে নেয়। তারা হাসানকে কাফির মুশরিক বলে গালি দিতে লাগলো। অবস্থা বেগতিক দেখে হজরত হাসান পালিয়ে আত্মগোপন করলেন। ভীরু, কাপুরুষ, নারী-লোভী হাসান, মুয়াবিয়ার কাছে সংবাদ দিলেন, তিনি বিনা

যুদ্ধে দুটি শর্তে আত্মসমর্পন করতে রাজী। শর্তনামায় হজরত হাসান লিখলেন- (এক) *কুফায় বাবার পৈত্রীক সম্পত্তি, রাজস্ব-খাতে জমাকৃত সোনা-দানা, টাকা-পয়সা আমাকে দিতে হবে, যাতে বাকি জীবনটুকু কাটাতে আমাকে আর্থিক সমস্যায় পড়তে না হয়।* (দুই) *আমার বাবা ও আমাদের পরিবারের নামে জুমআ'র নামাজে খুৎবা-পাঠে অভিশাপ দেয়া বন্ধ করতে হবে ।*

মুয়াবিয়া ইচ্ছে করলে বলপূর্বক কুফা দখল করতে পারতেন। কুফার সামান্য ধনের পিপাসা মুয়াবিয়ার নেই, আছে নবী মোহাম্মদের বংশের রক্ত-পান করার নেশা। বুদ্ধিমান মুয়াবিয়া অপ্রয়োজনে তাঁর একটি সৈন্যও হারাতে রাজী নন। হাসানের দুটো শর্তই তিনি মেনে নিলেন। তবে দ্বিতীয় শর্তের ব্যাপারে বল্লেন- রাষ্ট্রীয়ভাবে আলী-পরিবারকে অভিশাপ দেয়ার বাধ্য-বাধকতা উঠিয়ে দেয়া হলো, তবে জনগণ যদি সেচ্ছায় তা চর্চা করে তাতে সরকারের কিছু বলার থাকবেনা। হজরত আলীর অন্ধ সমর্থক, বেঁচে থাকা অবশিষ্ট শীয়া'দের পানে, ব্যক্তি স্বার্থপর হাসান ফিরে তাকালেন না। রাজস্ব কিছু সম্পদ নিয়ে স্বপরিবারে মদিনায় চলে যান। কুফায় হাসান আত্মসমর্পন করার কিছুদিন আগেই, বসোরার গভর্ণর (নবী বংশের) উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হজরত মুয়াবিয়াকে চিটি লিখে আত্মসমর্পন করে তার দলে যোগ দিয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরির অভিযোগে আলীর যুগেই অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সেচ্ছায় বসোরার গভর্ণরপদ ত্যাগ করার আগে রাজভান্ডার শুন্য করে নিয়ে যান। মুয়াবিয়া এখানেও অসন্তুষ্ট হলেন না। এখন শুধু হাসান আর হোসেনের প্রাণ দুটি হাতে এলেই হয়। মুয়াবিয়ার মিশন সম্পূর্ণ কমপ্লিট।

সমস্ত আরব বিশ্বের একচ্ছত্র অধিনায়ক সম্রাট মুয়াবিয়া রাজকীয় বেশে কুফায় প্রবেশ করলেন। জনগণ প্রফুল্ল চিত্তে ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করলো। কুফা নগরীকে বসোরার অন্তর্ভূক্ত করা হলো। দামেস্ক হলো মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী। এবার গোপনে সকলের অগোচরে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে নিলেই হয়। হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) গুপ্তচরের মাধ্যমে, হজরত হাসানের স্ত্রী যায়েদা বিন্‌তে আশা'ত বিন্ কায়েসকে জানিয়ে দিলেন- যায়েদা যদি তার স্বামী হাসানকে হত্যা করতে পারে, তাহলে তাকে একলক্ষ দিরহাম পুরস্কার দেয়া হবে এবং খলিফার পুত্রবধু করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হবে। একদিন হাসান রোজা ছিলেন। যায়েদা তার স্বামীকে দুধে বিষ মেশায়ে ইফতার করতে দেন। বিষ পানের চল্লিশ দিন পর ৬৭০ খৃষ্টাব্দে আরবী ৫০ হিজরীর সফর মাসে হজরত হাসান (রাঃ) ইহলোক ত্যাগ করেণ। যায়েদা স্বামীকে হত্যা করে যখন মুয়াবিয়ার কাছে তার পুরুস্কার দাবী করলেন, মুয়াবিয়া যায়েদাকে একলক্ষ দিরহাম পাঠিয়ে দিয়ে বল্লেন- স্বামী হত্যাকারী মহিলাকে আমার পুত্রবধু বানাতে পারিনা।

মুয়াবিয়া এবার ভাবলেন, নিজে ক্ষমতায় থাকতেই, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা উমাইয়া বংশের হাতে রাখার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রথমে বিশ্বস্ত ব্যক্তি-বর্গের সাথে আলোচনা করলেন। স্বপুত্র এজিদকে রাজপুত্র ঘোষনা দিয়ে, রাজতন্ত্র কায়েম করবেন। বিষয়টা সারা দেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করলো। হজরত মুয়াবিয়া তাঁর পুত্র এজিদকে 'রাজকুমার' না 'খলিফা' ঘোষনা দিয়েছিলেন, এবং গণতান্ত্রীক পন্থায় জনগনের সমর্থনে, না বল প্রয়োগ করে পুত্রের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন, এ নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সীমাহীন মতবিরোধ দেখা যায়।

আমরা প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত রাখার লক্ষ্যে দু'একটি উদাহরনের প্রতি আলোকপাত করবো।

Mu'awiyah was eager for people's agreement to give allegiance to his son Yazeed. He resolved to take allegiance to Yazeed as a crown prince. So he consulted the grandest companions, the masters of the people and the district's governors. They all accepted. Delegations from the districts came with acceptance to give allegiance to Yazeed. Many Companions gave him the allegiance as well. Hafij Abdul ghoni says: "His (Yazeed's) caliphate is rightful, sixty of the companions of the prophet gave him the allegiance. Abdullah Ibn`Umar was one of them." [Qayd Al-Shareed min Akhbar Yazeed, by Ibn Khaldoun, p.70]

তথ্যানুযায়ী নবীর সহচরী ৬০ জন সাহাবী স্বতঃস্ফুর্তভাবে মুয়াবিয়ার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন, সুতরাং এজিদকে ইসলাম বিরোধী বল্লে সাহাবীদেরকে অপমান করা হবে। হয় এজিদ ও সাহাবীগণ সত্যের পথে ছিলেন, না হয় যে অপরাধে এজিদ দোষী, সেই অপরাধে সাহাবীগণও দোষী।

মুয়াবিয়া তাঁর পুত্র এজিদকে বলেন-

"O my son, I have arranged everything for you, and I have made all the Arabs agree to obey you. No one will now oppose you in your title to the caliphate, but I am very much afraid of Husayn Ibn Ali, Abdullah Ibn Umar, Abdur Rahman Ibn Abu Bakr, and Abdullah ibn Zubayr. Among them Husayn Ibn Ali commands great love and respect because of his superior rights and close relationship to the Prophet. I do not think that the people of Iraq will abandon him until they have risen in rebellion for him against you. As far as possible, try to deal with him gently. But the man who will attack you with full force, like a lion attacks his prey, and who will pounce upon you, like a fox when it finds an opportunity to pounce, is Abdullah Ibn Zubayr. Whenever you get a chance, cut him into pieces." (Iqd al Fareed Volume 4 page 226)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবায়েরকে এজিদ কেটে টুকরো টুকরো করেছিলেন কিনা জানা যায়নি তবে পিতার অসম্পূর্ণ কাজটি তিনি পুরণ করেছিলেন। এজিদ অত্যন্ত নৃশংস, অমানুষিক ভাবে হজরত হোসেনকে (রাঃ) কারবালা প্রান্তরে স্বপরিবারে হত্যা করেন।

মৌলানা সৈয়দ কুতুব শহিদের লেখায় আমরা আরো দেখতে পাই-

‘After the oath was taken to Yazid in Syria Mu'awiya gave Syed ibn 'Aas the task of gaining the acceptance of the people of the Hejaz. This he was unable to do, so Mu'awiya went to Mecca with an army and with full treasury. He called together the principal Muslims and addressed them thus:
"You all know that I have lived among you, and you are aware also of my ties of kindred with you. Yazid is your brother and your nephew. It is my wish that you take the oath of allegiance to Yazid as the next

Caliph; then it will be you who will bestow offices and depose from them, who will collect and apportion money". He was answered by Abdullah ibn Zubair, who gave him a choice of three things to do, first he might do as Allah's Messenger had done and appoint no successor, second he might do as Abu Bakr had done and nominate a successor, third he might do as Umar had done, and hand over the whole matter to a council of six individuals, none of whom was a member of his own immediate family. Mu'awiya's anger was kindled, and he asked "Have you any more to say?" "No". Mu'awiya turned to the remainder of the company "And you?" "We agree with what Ibn Zubair has said", they replied. Then he addressed the meeting in threatening terms: "The one who warns is blameless. I was speaking among you, and one of you was bold to get up and call me a liar to my face. That I will bear and even forgive. But I stand to my words, and I swear by Allah that if any of you speaks one word against the position that I take up, no word of answer will he receive, but first the sword will take his head. And no man can do more than save his life".

Thereupon the commander of Mu'awiya's guard ordered two men to stand over each of the nobles of the Hejaz who opposed him and to each he said, "If your man leaves his guards to speak one word, either for me or against me, then let the guards strike off his head with their swords". Then he mounted the pulpit and proclaimed: "These men are the Leaders and the choicest of the Muslims; no matter can be successfully handled without them, nor can any decision be taken without their counsel. They are now satisfied to take the oath to Yazid and have indeed already taken that oath by the name of Allah". So the people took the oath.
Syed Qutb Shaheed in "Social Justice in Islam" (English translation pages 209-210):

মৌলানা হজরত রসিদ আখতার (দেওবন্দী) তাঁর ‘তাহজীব আওর তামাদ্দুনে ইসলাম’ বইয়ে উল্লেখ করেন- হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) মানুষকে জোরপূর্বক এজিদকে খলিফা মানতে বাধ্য করেণ। একই বক্তব্য পাওয়া যায় সিরিয়ান লেখক হজরত রসিদ রেজার ‘ইমামাতুল উজমা’ বইয়ে। অধ্যাপক সাইয়্যেদ আকবর এলাহাবাদী ‘মুসলমান কা উরজ আওর জাওয়াল’ এবং সাইয়্যেদ আবুল আ’লা মওদুদি ‘খেলাফত আওর মুলকিয়াত’ বইয়ে, উভয়েই মুয়াবিয়াকে অন্যায়ভাবে জোরপুর্বক ক্ষমতা দখল করার দায়ে অভিযুক্ত করেণ।
তবে সুখের কথা হলো, কোন প্রকার সংঘাত, প্রাণহানী ছাড়াই হজরত মুয়াবিয়া তাঁর রাজতন্ত্র কায়েম করার ইচ্ছে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন। ৬৮০ খৃষ্টাব্দে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর, এজিদ তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। উমাইয়া বংশ ৬৬১ থেকে ৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এক নাগাড়ে প্রায় ৯০ বৎসর রাজত্ব করেছিল। তাই হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) আরব বিশ্বে উমাইয়া রাজতন্ত্রের স্থপতি হিসেবেই চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সমাপ্ত-